ঃ যোগাযোগ ঃ
প্রতাপ দীঘি লোক বিজ্ঞান সংস্থা, পূর্ব মেদিনীপুর, শোভনলাল সাহু -৯৭৩২৬৮১১০৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব ৯২৩২৮২৮৩৩৩।

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ যোগাযোগ ঃ
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৯৪৩৪১১০৯৬৯, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ৯৪৭৭০৬৪৭০৪, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ৯৬০৯৭৪২৯৯৭, কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা- ৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬, সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ-৯৪৩৪৫৭০১৩০

বর্ষ-১১ সংখ্যা - ২ মার্চ-এপ্রিল/২০১৪ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২ টাকা

খাবারের আঁশ ঃ সুস্থ খাদ্য তালিকার জন্য আবশ্যক

মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন হয় তার বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য। তার কর্মঠ সফল ও সুস্থ জীবন যাপিত হয় উপযুক্ত পুষ্টিতে। শরীরের পুষ্টি পদার্থের মধ্যে ডায়েটারী ফাইবার বা খাবারের আঁশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ। অপাচিত ও বিশোষনে অপারগ খোসা প্রধান উদ্ভিদ খাদ্য বস্তু যা মানুষের পরিপাক নালীতে ক্ষরিত উৎসেচকের উপস্থিতিতে জলবিশ্লিষ্ট হয় না, তাই হল ডায়েটারী ফাইবার অর্থাৎ খাবারের আঁশ। এই ফাইবার কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন বা ফ্যাটের মত পরিপোষক খাদ্য নয়। কারণ এই সব খাদ্য উৎসেচকের উপস্থিতিতে বিশ্লিষ্ট ও পাচিত হয়ে সরল খাদ্য কণায় পরিণত হয়ে দেহকোষে শোষিত হয়। দেহে পুষ্টি প্রদান করে। ফাইবার পাচিত হয় না। পাচক রসে জারিত হয় না। ক্ষুদ্রান্ত্র অতিক্রম করে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। এদের অপাচিত থাকার গুণে এরা খাদ্য তালিকায় বিশেষ সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানোর জন্য রোগ প্রতিরোধে ফাইবারের প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে।

ফাইবার দুরকমের হয়ঃ দ্রবনীয় ও অদ্রবনীয়। দ্রবনীয় ফাইবার জলে দ্রবনীয়। দ্রবনীয় হয়ে জেলী সদৃশ বস্তুতে পরিণত হয় এবং কোলনে সন্ধান ঘটায় বা ফারমেন্টেড হয়ে গ্যাস ও শারীরবৃত্তীয় সক্রিয় উপজাতবস্তু উৎপন্ন করে। অদ্রবনীয় ফাইবার জলে দ্রবনীয় নয়। এই ফাইবার পরিপাক নালীর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় জল শোষণ করে আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোলনে সন্ধান ঘটিয়ে গ্যাস ও সক্রিয়

এরপর 2 পাতায়

গ্রাফিন নিয়ে কিছু কথা

মানব সভ্যতা শুরু হয়েছিল প্রস্তর যুগ থেকে। তারপর তাম্রযুগ, লৌহযুগ, মিলিকন টেকনোলজিকে পেছনে ফেলে ন্যানোটেকনোলজি যুগের শুভারম্ভ হয়েছে গ্রাফিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। সম্মিলিত ভাবে কোনও একটা মৌলের কার্বনের মতো এত ব্যাপক অবদান বোধ হয় আর নেই। জীবজগতে হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলে এর বিপুল প্রকাশেরকথা বাদ দিয়ে আমরা যদি শুধুমাত্র ফুলরিন ও গ্রাফিনের কথাই ধরি তাহলেও এর অবদান একেবারে ছোট হবে না।

২০০৪ সালে ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে ড. জিম ও ড. নোভো-সেলভ দেখালেন কার্বনের একটা স্তর গ্রাফাইট থেকে তুলে আনা সম্ভব।

এরপর 3 পাতায়

ঘরের দূষণে নানা অসুখ

নানা কারণে দূষক অর্থাৎ পলিউট্যান্ট এর প্রভাবে ঘরের মধ্যে দূষণ ঘটে। এই দূষক পদার্থগুলো নানা উপায়ে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে, ফলে শরীরের হোমিওস্টাসিস সিস্টেম বিঘ্নিত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে এরা ডেকে আনে হাজারখানেক স্বাস্থ্য সমস্যা। মানুষের ক্ষেত্রে এই দূষণের ফলাফল খুব ব্যাপক। যেমনঃ—

১) শ্বাসজনিত - আমরা যখন শ্বাস নিই, তখন প্রশ্বাসের মাধ্যমে বাতাসে থাকা বিভিন্ন দূষিত গ্যাস, পার্টিকুলেট, ডাস্ট শ্বাসনালি, ব্রঙ্কাই, ব্রঙ্কিওলস হয়ে ফুসফুসে ঢোকে। এই দূষকগুলো এখানে থেকে বা রক্তের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে, শরীরে নানা সমস্যা তৈরী করে।

২) আঘ্রাণজনিত - বিভিন্ন দূষক গ্যাস, গন্ধসৃষ্টিকারী কণা এবং ফিউম আমাদের নাসাপথের মিউকাস আবরণীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে পারে। এরফলে, মিউকাস ঝিল্লি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে নানা রোগ ডেকে আনে। মিউকাস ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়।

এরপর 5 পাতায়

ফুকুশিমা আর নয়

১১ মার্চ, ফুকুশিমা দিবস। ২০১১ সালের এই দিনটিতে জাপানের ফুকুশিমা দাইচি পরমাণু কেন্দ্রে এক ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে। সেখানে মোট ৬টি পরমাণু চুল্লি ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের কাছে অবস্থিত ওই কেন্দ্রের সুইচিং স্টেশন সুনামির জলে ডুবে অকেজো হয়ে যায়। বিপদের সময় চুল্লিগুলো নিজে থেকে বন্ধ হয়ে গেলেও তার অন্তঃস্থলের প্রচন্ড উত্তপ্ত পরমাণু-জ্বালানিদণ্ডে শীতল জলের প্রবাহও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে একে একে ৩টি চুল্লির তেজস্ক্রিয় জ্বালানি

এরপর 8 পাতায়

গঙ্গাজল পচে না কেন

আমাদের কাছে গঙ্গাজল অতি পবিত্র। আমাদের জীবনের সঙ্গে এই জল ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যে নদীগুলির তীর বরাবর ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তাদের মধ্যে গঙ্গা নদী অন্যতম। আমরা গঙ্গাকে দেবীরূপে কল্পনা করে থাকি। যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে এই নদীর মাহাত্ম ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আমাদের ধারণা গঙ্গাজল পবিত্র বলে তাকে দীর্ঘদিন কোনো পাত্রে রেখে দিলেও তাতে পচন ধরে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক

এরপর 7 পাতায়

খাবারের আঁশ

1 পাতার পর

উপজাত বস্তু উৎপন্ন করে। ফাইবার কোন কোন উদ্ভিদজ্জ খাদ্যে বেশি থাকে অথবা কোন কোন খাদ্যে কম থাকে। এগুলি অপাচ্য যৌগ শর্করা। এগুলির মধ্যে পড়ে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ পেকটিন, গাম, মিউসিলেজ। এছাও আছে লিগনিন। এটি ফিনাইল প্রোপেন দিয়ে গঠিত বিশেষ অ্যারোমেটিক যৌগ। এই সব আঁশ উদ্ভিদ কোষ বা কোষের ভিতরের গঠনের সহায়ক বস্তু। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বহুদিন পর্যন্ত এই আঁশকে নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলেই মনে করতেন। কিন্তু ১৯৭০ সালের পর এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে আধুনিক সভ্যতাজনিত খাদ্যাভ্যাসের ফলে অতিরিক্ত রিফাইন্ড বা পরিমার্জিত খাদ্য গ্রহণ ও আঁশযুক্ত খাদ্য বর্জনকেই বর্তমানের যাবতীয় রোগের কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রে বা ব্রিটেনে খাদ্যতালিকায় শতকরা ২০ ভাগ আঁশযুক্ত খাবার। আফ্রিকানদের খাদ্যতালিকায় শতকরা ৫০-১৫০ ভাগ ফাইবার থাকে। আবার এস্কিমোদের খাদ্য তালিকায় এই ফাইবার প্রায় একেবারেই নেই বললেই চলে। অনেকে মনে করেন খাবারে আঁশের তেমন কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমানে ডায়েটারী ফাইবারের উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে। খাদ্যে দ্রবনীয় ফাইবার আছে এমন কিছু উদাহরণ হল, মটর সয়াবীন ও অন্যান্য বীনস, ওট, বার্লি, কুল, খেজুর, কলা, আপেল ও পিয়াজের ভিতরের শাঁস, মিষ্টি আলু, পেঁয়াজ, বদাম, কাঠবাদাম প্রভৃতি। আর অদ্রবনীয় ফাইবার থাকে গোটা শস্যে গম, ভুট্টা, বীন, মটর, আলুর খোসায়, ফুলকপি, কুলু ন্যাসপাতি, কিউই ফল, টমাটো ইত্যাদিতে একই খাদ্যে ভিন্ন অনুপাতে উভয় প্রকার ফাইবার থাকতে পারে।

ফাইবারের উপকারিতা ঃ—

১) পরিতৃপ্তির অনুভূতি এবং দেহের ওজন বা মেদ নিয়ন্ত্রণ ঃ

জলে দ্রবনীয় বা জলে অদ্রবনীয় উভয় প্রকার আঁশযুক্ত খাদ্যের গাঢ়ত্বের কারণে চর্বনে সময় দিতে হয় অর্থাৎ চিবোতে উৎসাহ বা আগ্রহ আসে। এর ফলে পাচক রস ক্ষরণ বেড়ে যায় (অ্যামাইলেজ)। খাদ্য তালিকার ফাইবারের দ্রবনীয় অংশ প্রাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ বস্তুর ঘনত্ব বা আয়তন বাড়ায়। তার ফলে পাকস্থলী পূর্ণ অনুভূত হয় এবং শূন্য বা খালি হতে বিলম্ব ঘটে। ফলে পাচনের গতি হ্রাস পায়। একটি পরিতৃপ্তির অনুভূতি জন্মায়। পেট অনেকক্ষণ ভর্তি থাকে। ফাইবারের এনার্জি ধারণের ক্ষমতা খুবই কম। তাই শরীরে কম ক্যালোরী গৃহীত হয়। এইভাবে মেদ বৃদ্ধিও হ্রাস পায়। তাই ফাইবার গ্রহণও স্থূলতার মধ্যে রয়েছে একটি বিপরীত সম্পর্ক।

২) কোষ্ঠকাঠিন্য ও অন্যান্য অসুবিধা দূরীকরণ ঃ

ফাইবার সারক বা জোলাপের মত কাজ করে। পাচিত খাদ্য বস্তু শোষিত হওয়ার পর পরিপাক নালী অতিক্রম করার গতি বৃদ্ধি করে এবং কোলনে উপস্থিত হয়ে মলে পরিণত হয়। দ্রবনীয় ফাইবার পাচিত বস্তুর ওজন, ঘনত্ব ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করেও নমনীয় করে দেহ থেকে নির্গমন ব্যবস্থা সহজ করে।

৩) পেটের নানারকম অস্বস্তিকর অবস্থা নিয়ন্ত্রণ ঃ

এইসব অবস্থার মধ্যে পড়ে কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপা, পেট ব্যথা, পেটভার, পেট খারাপ প্রভৃতি। এইসব নানারকম পেটের সামগ্রিক অবস্থাকে পেটের উত্তেজনা প্রবন লক্ষনাদি বা সংক্ষেপে বলে আইবিএস।

পেটের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ ঃ খাদ্যে আঁশ অন্ত্রের হিমোরয়েড ও ডাইভার্টি কুলোসিস অবস্থা প্রহিত করে। হিমোরয়েড অবস্থায় অন্ত্রের নিম্নভাগের শিরায় স্ফীতি দেখা দেয়। ডাইভার্টি কুলোসিসের ক্ষেত্রে অন্ত্রের গায়ে থলির মত অংশ বা পকেট তৈরী হয়। ডাইভার্টিকুলার রোগ অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক ও কষ্টকর। সময়ে সময়ে এই পকেটে খাদ্য ঢুকে যায় ও জীবানুদুষ্ট হয়ে শরীরের ক্ষতি করে। অধিক ফাইবার যুক্ত খাদ্য গ্রহণে এর উপসম ঘটে।

৪) ক্যান্সার প্রতিরোধ ঃ অসংক্রমন যোগ্য ব্যধির অন্যতম পেটের ক্যান্সার ও ব্রেস্ট ক্যান্সারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে খাবারের ফাইবার। কোন কোন ক্যান্সারের আশঙ্কা ফাইবার কমিয়ে দেয়। দেখা গেছে, দেহ থেকে অন্ত্রের বর্জ্য পদার্থের নির্গমনের হার অদ্রবনীয় ফাইবার বৃদ্ধি করে। দেহে পরিপাক শেষে উৎপন্ন বর্জ্য ও বিষাক্ত পদার্থের সম্মুখীন কম হয়। কোলনে ডায়েটারী ফাইবার বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তার জল ধারণের ক্ষমতর জন্য। তাই অদ্রবনীয় ফাইবার বর্জ্য পদার্থের নির্গমন সময় বাড়িয়ে দেয়। এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময়ে স্টেরল থেকে ক্যান্সারজনক বা কার্সিনোজেনিক পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তৈরী হয়। জনসমীক্ষায় জানা গেছে ও প্রস্তাবিত হয়েছে কোলনে বর্জ্য পদার্থের কম ওজন হলে কোলন ক্যান্সার বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকছে। ডায়েটারী ফাইবার আরও বিষাক্ত পদার্থে, পিত্ত অম্ল ও অন্যান্য ক্যান্সারজনক পদর্থের সঙ্গে যুক্ত হয়।

কোলেস্টেরল এর সঙ্গে ফাইবারের সম্পর্ক ঃ

রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ২০০ mg/dl মত হলে করোনারী হার্ট ডিসিজ বা কার্ডিওভাস্কুলার রোগ হওয়ার ভয় কম থাকে. দেহে কোলেস্টেরল ব্যবহৃত হয় পিত্ত রস তৈরীতে। কিছু ধরণের দ্রবনীয় ফাইবার পিত্ত অম্লের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেহে পুনঃ প্রবেশে বাধা দান করে। ফলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায়। অন্ত্রের পিত্ত অম্ল বেরিয়ে যাওয়ার ফলে কোলেস্টেরল থেকে পিত্ত অম্ল সংশ্লেষন বেড়ে যায়। ফলে দেহে কোলেস্টেরলও হ্রাস পায়। এছাড়া ফাইবার রক্তে ভেরিলো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন ও লোডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনের মাত্রা কমায়। ট্রাইগ্লিসারল ও গ্লিসারলের মাত্রাও কমায়। ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রেখে হৃদপিন্ডকে ভাল রাখে।

ঘন বা সান্দ্র দ্রবনীয় ফাইবার গ্লুকোজ শোষনের মাত্রা কমায় ঃ

অন্ত্রের মিউকাস মেমব্রেনে গ্লুকোজ পরিবাহককে উদ্দীপিত করে গ্লুকোজ শোষণ প্রশমন করে। ফাইবার গ্লুকোজ টলারেন্স ও ইনসুলিন প্রতিক্রিয়া উন্নত করে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা সুস্থিত করে প্যানক্রিয়াসের (অগ্নাশয়) ইনসুলিন মোচন এবং যকৃতে গ্লাইকোজেনোলাইসিস নিয়ন্ত্রণ করে। এক ধরণের শ্বেতসার প্রতিরোধী অদ্রবনীয় ডায়েটারী ফাইবার সরাসরি ইনসুলিনের সংবেদনমাত্রা বিশেষভাবে বাড়িয়ে দেয় এবং সুস্থ মানুষের টাইপ ২ ডায়াবেটিস হতে বিরত রাখে।

দ্রবনীয় ফাইবার সন্ধান ঘটিয়ে ছোট ছোট ফ্যাটি অ্যাসিড গঠন করেঃ

এইসব ছোট শৃঙ্খলের ফ্যাটি অ্যাসিড শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরী হয়। এইগুলি হল বিউটিরেট, প্রোপিওনেট এবং অ্যাসিটেট। বিউটিরেট হচ্ছে কোলনের উসাইটের জন্য এনার্জিদায়ক উৎস। যকৃত প্রোপিওনেট গ্রহণ করে আর অ্যাসিটেট পার্শ্বীয় সংবহনে প্রবেশের পর পার্শ্বীয় কলায় বিপাক সম্পন্ন করে। ছোট শৃঙ্খলের ফ্যাটি অ্যাসিড কোলনের পিএইচ হ্রাস করে অর্থাৎ কোলনে আম্লিক মাত্রা বৃদ্ধি করে। এই কারণে কোলনের আবরনে পলিপ গঠন হওয়ার সম্ভবনা থাকে না। আর ডায়েটারী ফাইবার খনিজ দ্রব্য শোষণ বৃদ্ধি

এরপর 3 পাতায়

খাবারের আঁশ

2 পাতার পর

করে। ছোট শৃঙ্খলের ফ্যাটি অ্যাসিড হেলপার কোষ। অ্যান্টিবডি লিউকোসাইট, সাইটোকাইন্স উৎপাদনে উত্তেজিত করে এবং ইমিউন রক্ষায় লিম্ফের কার্যকারিতায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ছোট শৃঙ্খলের ফ্যাটি অ্যাসিড কোলনের মিউকাস আবরণীর প্রদাহ ও আবরণী সংলগ্ন প্রদাহ জনক বস্তু বা প্রদাহকে বাধা দেওয়ার গুণ বাড়িয়ে দেয় ইমিউন কার্যকারিতা বাড়িয়ে। এক কথায় বলতে গেলে ছোট শৃঙ্খলের ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি প্রধান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপক - যেমন রক্তে গ্লুকোজ ও লিপিডের মাত্রা, কোলনের পরিবেশ এবং তন্ত্রের অনাক্রমত্য ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। সুস্থ থাকার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য তালিকায় ফাইবার রাখা খুব জরুরী। বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে ও সন্তান সম্ভাবা নারীদের জন্য এবং অবশ্যই অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও ফাইবার খুব উপকারী। একজন ভারতীয়ের খাদ্য তালিকায় শতকরা ৪০ ভাগ ফাইবারের সুপারিশ করেছিল পুষ্টি বিজ্ঞানীরা। ভারতীয় আয়ু বিজ্ঞান পরিষদের পুষ্টি উপদেষ্টাদের সুপারিশ অনুযায়ী আবহাওয়া, শারীরবৃত্তীয় অবস্থা ও খাদ্যতালিকায় উপস্থিত অন্যান্য পরিপোষক খাদ্যগুলির পারস্পরিক অনুপাতের উপর নির্ভর করছে আঁশযুক্ত খাবারের সঠিক পরিমান ও তার উপকারিতা। ৫০ বা তার নীচের বয়সের জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে ৩৮ গ্রাম ও স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে ২৫ গ্রাম আঁশযুক্ত খাবার। অপর পক্ষে ৫০ ও তার উর্ধে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এর পরিমান কিছু কম। পুরুষদের ক্ষেত্রে ৩০ গ্রাম আর স্ত্রী লোকদের ক্ষেত্রে ২১ গ্রাম। অথবা ২৫ গ্রাম প্রতিদিন ২০০০ ক্যালোরী ডায়েটে অথবা ৩০ গ্রাম প্রতিদিন ২৫০০ ক্যালোরী খাদ্য তালিকায়।

অতিরিক্ত ডায়েটারী ফাইবার গ্রহণের অসুবিধা—

খাদ্য তালিকার ফাইবারের আধিক্যে ক্ষুদ্রান্ত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে গ্যাস উৎপন্ন হয়। পেট ফাঁপে বদহজম ইত্যাদির লক্ষণ প্রকাশ পায়। জল কম গ্রহণ করলে এসময়ে কোষ্ঠ কাঠিন্যও দেখা দেয়। এছাড়া দেহে ক্যালসিয়াম, আয়রণ, জিঙ্কায় ও ম্যাগনেশিয়াম শোষণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বিশেষতঃ অল্প বয়স্কদের ক্ষেত্রে। ফাইবার যদিও খুব দরকারী ও খাদ্য তালিকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবুও একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য তালিকার এটি একটি অংশ এর পরিমানও সঠিক হওয়া দরকার। অর্থাৎ প্রধান পরিপোষক খাদ্যগুলির পারস্পরিক অনুপাতের উপর নির্ভর করছে আঁশযুক্ত খাবারের উপযুক্ত পরিমান তার উপকারিতা।

লেখক ঃ সতী চক্রবর্তী, ৩৯/১ ইন্দ্রানী পার্ক, কলকাতা-৭০০০৩৩
ফোন ঃ ২৪১৭ ৯৭৫৯, ৯৮৩০৭৪৪৩৪০

গ্রাফিন নিয়ে কিছু কথা

1 পাতার পর

একটা স্কচটেপ এক টুকরো গ্রাফাইটে চেপে লাগিয়ে বেশ জোরে টানলে একটা স্তর বেরিয়ে আসে। এই আবিষ্কারের জন্য ২০১০ সালে এরা দুজন পদার্থবিদ নোবেল পুরস্কার পান। গ্রাফাইটের এই এক স্তর অবস্থার নাম গ্রাফিন। গ্রাফাইটের একটা স্তরের নাম হিসাবে গ্রাফিন শব্দটা কিন্তু ১৯৬২ তে অধ্যাপক বোত্রম প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তিনিই প্রথম রাসায়নিক পদ্ধতিতে এটা আলাদা করে এক্সরের মাধ্যমে সঠিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাই তার নাম নোবেল প্রাইজ না থাকার ব্যাপারটা সহজে মেনে নেওয়া যায় না।

দ্য মিনেস্ট মেটেরিয়াল ইন দ্য ওর্য়াল্ড। জিনিসটা আসলে কার্বন পরমাণু একটা চাদর। ছটা করে কার্বন পরমানু পরপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে (অনেকটা মৌচাকের মতো) তৈরী করেছে এই চাদর। পরমাণুর চেয়ে ছোট কণা অনেক আছে। কিন্তু তাদের দিয়ে এভাবে চাদর তৈরী করা এখনও সম্ভব হয়নি। কার্বনের এই চাদরটা পৃথিবীতে সবচেয়ে পাতলা পদার্থ। ওরকম ২ লাখ চাদর পরপর বসালে একটি মোটা চুলের সমান হবে। দুই রাশিয়ান বিজ্ঞানীর ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে যে যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন গ্রাফাইটের অনুকরণে তাকে বলা হচ্ছে গ্রাফিন। গ্রাফিনের দুটি স্তরের অন্তবর্তী দুরত্ব ০.৩৩৫ মিলিমিটার এবং সি-সি বন্ধন দৈর্ঘ্য ০.১৪২ মিলিমিটার। ল্যাবরেটরিতে গ্রাফিন তৈরীর সাফল্য রীতিমত বিস্ময়কর। বলা চলে ন্যানো টেকনোলজির এক চমকপদ সাফল্য হল গ্রাফিনের আবিষ্কার।

ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কোস্টায়া নবোসেলভ জানিয়েছেন, গ্রাফিনের বহুমুখী ব্যবহারের কথা। পাতলা ও দূর কার্বনের এই রূপভেদটি স্টিল অপেক্ষা ১০০ গুণ শক্তিশালী। ইহার পরিবাহিতা অন্যান্য সাধারণ পরিধিগুলির থেকে অনেক বেশী। ইহার পাতলা চাদরের মধ্য দিয়ে হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণু এমনকি জলীয় বারুদ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে। গ্রাফিনের এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে দুই নোবেল জয়ী পদার্থবিদ একটি প্লে ফুল এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। তারা গ্রাফিন পর্দার মাধ্যমে জলীয় বাষ্প দূরীভূত করে ভোডকা পাতিত করে গাঢ় করেছিলেন।

গ্রাফিন বিদ্যুত পরিবাহী এবং কাজ করতে পারে ট্রানজিস্টর হিসেবে তাই কম্পিউটার প্রযুক্তিতে এর অবদান অনস্বিকার্য। সমুদ্রের জল থেকে লবন পৃথকীকরণে গ্রাফিন ব্যবহার করা যেতে পারে। এর থেকে প্রাপ্ত জলও পানের যোগ্য। বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীগুলো গ্রাফিনের স্বচ্ছ ও পরিবাহিতা গুণকে কাজে লাগিয়ে টাচ্ স্ক্রিন ইন্টারফেসকে আরো উন্নত করে চলেছে। বিজ্ঞানীরা গ্রাফিনকে কিভাবে বিল্ডিং মেটিরিয়াল হিসাবে কিভাবে কাজে লাগানো যায়. তার নতুন দিশা খুজছেন। গ্রাফিনের তৈরী উড়ো হাজের বিশেষ বিশেষ অংশ উড়ো জাহাজের ওজন কমাতে সক্ষম হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। গ্রাফিন একদিকে যেমন কোনো বিস্ফোরকে উপস্থিত নাইট্রেটস্ ও অ্যামোনিয়াকে তুলে আনতে সক্ষম আবার তেজস্ক্রিয় অপদ্রব্যকে শোষণ করতেও সক্ষম।

ন্যানোটেকনোলজিস্টরা অবশ্য নোবেল জয়ী ফাইনম্যানকে মনে রাখেন এক বক্তৃতর জন্য। ১৯৫৯ এর ডিসেম্বরে আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন বলেছিল তার কর্মস্থল ছিল ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউ অব্ টেক্নোলজিতে। তিনি আলোচনা করেছিলেন কোনও কিছুর সাইজ ছোট, আরও ছোট করার প্রক্রিয়ার বিপুল লাভ ও তার সমস্যাদি নিয়ে। প্রশ্ন করেছিলেন ২৪ ভলুউমের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকানর সব তথ্য কেন ছাপানো যাবে না একটা পিন এর মাথায় ? বস্তুত এই বক্তৃতার বছরটিকে ন্যানো প্রযুক্তির শূন্য বছর ধরা হয়। এই সময় থেকেই ন্যানো প্রযুক্তির সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। আজ সারা পৃথিবী ন্যানো প্রযুক্তির গবেষণায় ব্যস্ত। তবে একটা চিন্তা থেকেই যায় ন্যানো প্রযুক্তি কোন পর্যন্ত কী যে পরিণত হবে ঃ আশীর্বাদ না অভিশাপ ?

লেখক ঃ ডঃ তপন দাস, সহঃ শিক্ষক, গোসানীমারি হাই স্কুল, দিনহাটা, কোচবিহার। মোঃ-৯৪৩৪৬৮৬৭৪৯

ফুকুশিমা আর নয়

1 পাতার পর

বিভাজনকক্ষের ৮-১০ ইঞ্চি পুরু পেটানো স্টিল এবং কয়েক ফুট কংক্রিট গলিয়ে মাটির গভীরে কোথায় চলে গেছে হদিশ নেই।

১২ মার্চ ২ নম্বর চুল্লি, ১৪ মার্চ ৩ নম্বর চুল্লি এবং ১৫ মার্চ ২ ও ৪ নম্বর চুল্লি হাইড্রোজেন বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়। বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও উঁচুমাত্রার তেজস্ক্রিয় জল চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি চুল্লির মাথায় ছিল পোড়া বা নিঃশেষিত জ্বালানি রাখার জলধার। সেখানে জল সরবরাহ কমে যাওয়াতেও বিপুল পরিমাণ বিকিরণ ছড়িয়েছে।

বহু মাইল দূর পর্যন্ত পরিবেশে ছড়িয়েছে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন, সিজিয়াম, স্ট্রনশিয়াম, প্লুটোনিয়াম সহ আরও নানান তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক বা আইসোটোপ। প্লুটোনিয়াম থাকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর। এইসব সমস্থানিক মানুষের শরীরে নানা ধরণের ক্যান্সার, লিউকোমিয়া ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যধির জন্ম দেয়। (যেমন স্ট্রনশিয়াম প্রাণি শরীরে খুব সহজে প্রবেশ করে, হাড়ে বাসা বাঁধে, এবং নানান ধরণের ক্যান্সারের কারণ হয়।) ওই পরমাণু কেন্দ্রের অন্তত ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে মানুষের বসবাস আর চলবে না। যেমন হয়েছে ১৯৮৬ চেরনোবিল পরমাণু দূর্ঘটনায়, ইউক্রেনের কিয়েভে।

অসম্ভব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বা খরচসাপেক্ষ বলেই ফুকুশিমা দূর্ঘটনার পর জার্মানি, বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যান্ড তাদের চুল্লিগুলো পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতালি ও অস্ট্রিয়া পরমাণু কর্মসূচী বাতিল করেছে। ফ্রান্স ২০২৫ সালের মধ্যে অর্ধেক চুল্লি বন্ধ করবে বলেছে। কোনো উন্নত দেশে পরমাণু শক্তির প্রসার ঘটছে না। অথচ ভারত, চিন ও রাশিয়া গোঁ ধরেছে, যে তারা পরমাণু কর্মসূচী চালিয়ে যাবে। ভারতে ছয় দশকের চেষ্টায় এবং অফুরন্ত খরচে এখন ২১টি চুল্লি চালু রয়েছে, যার উৎপাদন ক্ষমতা ৫,৩২২ মেগাওয়াট। আরও ৬টি নির্মান চলছে। নতুন চুল্লি স্থাপনের জায়গা খোঁজা হচ্ছে। নেতা-মন্ত্রীরা বলছেন, পরমাণু বিদ্যুৎ ছাড়া ভারতের নাকি মোটেই চলবে না। অথচ ৭-৮ বছরের বেসরকরি উদ্যোগেই এদেশে বায়ু বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা হয়েছে ২০ হাজার মেগাওয়াট। বছর দু-তিনের চেষ্টায় সৌর কোষের উৎপাদন ক্ষমতা হয়েছে, ২,২০০ মেগাওয়াট। তাহলে পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে অত মাতামাতির উদ্দেশ্য কী? পরমাণু বোমা ও চুল্লি যমজ ভাই বলেই কি তারা পরমাণু বিদ্যুতের কথায় গদগদ হয়ে পড়েন? আর বিদেশি কোম্পানী যখন আবদার করে যে তারা চুল্লি বিক্রি করবে কিন্তু তাদের নির্মানের কোনো ত্রুটির কারণে দূর্ঘটনা ঘটলে তার দায় নেবে না, অমন আবদারও মেনে নেন।

৫০-এর দশকের শেষভাগ থেকে পৃথিবীতে বাণিজ্যিক পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। এখন তার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লক্ষ ৭০ হাজার মেগাওয়াট। ওদিকে অনেক অযত্ন, অবহেলার পর মাত্র ৭-৮ বছর ধরে ব্যাপক বৃদ্ধি শুরু হয়ে নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রে উল্লম্ফন ঘটে গেছে। বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ১৮ হাজার মেগাওয়াট। সৌরবিদ্যুৎ প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার মেগাওয়াট। যদিও পরমাণু বিদ্যুৎকে সরকার হাতি পোষার মতো করে পোষে। কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ ও দূষণের কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, পরমাণু বিদ্যুৎ ও জীবাশ্ম জ্বালানির ক্ষেত্রে যে সরকারি ভরতুকি থাকে, বায়ু ও সৌর বিদ্যুৎ উৎপদনের কর ছাড় হিসেবে তার এক ভগ্নাংশ ব্যয় হয়। তাছাড়া ভারত, চিন, রাশিয়ার মতো অনেক দেশেই পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সরকারি ভাবে। বিকল্প বিদ্যুতের ক্ষেত্রে কিন্তু সরকারি বিনিয়োগ শূন্য।

তাই সময় এসেছে, পরমাণু মুক্ত পৃথিবীর দিকে সবাই মিলে এগিয়ে যাওয়ার। — *রিমেম্বারিং ফুকুশিমা কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ*

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস ২০১৪ঃ পুরস্কার পেলেন বিজ্ঞান কর্মী জয়দেব দে

২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানী অবনিভূষণ ঘোষ শতবর্ষ পুরস্কার কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান সংগঠন বিজ্ঞান দরবারের সদস্য জয়দেব দে কে প্রধান করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন বিজ্ঞানী পরিবেশ কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়। রাজা রাউত, প্রকাশ দাস বিশ্বাস, রণতোষ চক্রবর্ত্তী, সুমিত্রা চক্রবর্তী সহ প্রায় ১৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। ডঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী, পথিক গুহ, ডঃ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা উপস্থিত থাকেন ও তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। পুরস্কার পেয়ে বিজ্ঞান কর্মী জয়দেব দে জানান, বিজ্ঞান দরবার সংস্থা ১৯৮০ সাল থেকে বিজ্ঞান প্রচারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ২০০৫ সালে রাজ্যের সেরা বিজ্ঞান সংস্থা হিসাবে মেঘনাদ সাহা পুরস্কার পায় বিজ্ঞান দরবার। পুরস্কার পাওয়ায় বিজ্ঞানের কাজে আরও দায়িত্ব বেড়ে গেল বলে জানান শ্রী দে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক দীপক কুমার দাঁ।

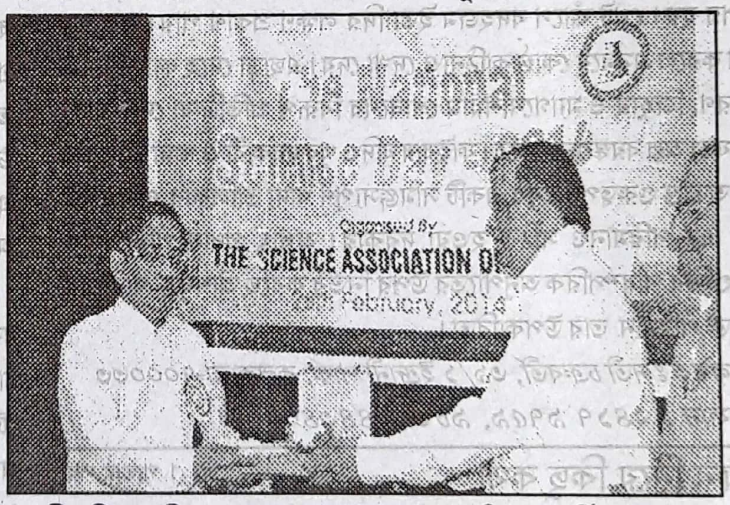

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস ২০১৪ঃ পুরস্কার পেলেন বিজ্ঞান কর্মী জয়দেব দে
ছবিঃ তাপস মজুমদার

স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে আলোচনা ঃ ২ মার্চ কলকাতা ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের টাওয়ারের ৪ তলার হল ঘরে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ডাঃ পুন্যব্রত গুন, ডাঃ সিদ্ধার্থ গুপ্ত প্রমুখ। সভায় বিজ্ঞান দরবার, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা সহ ৩০টি সংস্থা অংশগ্রহণ করেন।

ঘরের দূষণে নানা অসুখ

1 পাতার পর

৩) সংস্পর্শজনিত - অনাবৃত দেহত্বক মুখ ঠোঁট এবং চোখ বায়ুদূষকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই দূষক পদার্থগুলো কিভাবে আমাদের শরীরের ক্ষতি করে?

আমাদের শরীরে কিভাবে এই দূষকগুলো ক্ষতি করে তা জানতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে এরা মানুষের দেহে কি কি ভাবে কাজ করে অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় জানতে হবে এদের মোড অব অ্যাকশন। মোটামুটিভাবে এই দূষক পদার্থগুলো আমাদের শরীরের কোষে ৩টি উপায়ে কাজ করে। যেমন —

১) উৎসেচক ওপর ঃ— আমাদের দেহে অনবরত ঘটে চলেছে নানা রাসায়নিক বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়াতে লাগে নানা ধরণের উৎসেচক। দূষকপদার্থগুলো এই উৎসেচকগুলোর সক্রিয়তার পরিবর্তন ঘটিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়াটিকে বিঘ্নিত করতে পারে। এতে কোষের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়।

২) কোষীয় অণুর সঙ্গে সংযুক্তি ঃ— কিছু কিছু দূষক পদার্থ আছে যারা কোষ বাকোষীয় অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেহের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটায়। এর ফলেও কোষের স্বাভাবিক কাজ নষ্ট হয়। যেমন - কার্বন মনো অক্সাইড লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন পরিবহনে বাধা দেয়।

৩) ক্ষতিকারক রাসায়নিক নিঃসরণ ঃ— বিশেষ কিছু ধরণের দূষক পদার্থ আছে, যাদের উপস্থিতিতে কোষে অত্যাধিক রাসায়নিক বস্তুর নিঃসরণ ঘটে। এতে কোষে মন্দ প্রভাব সৃষ্টি হয়। যেমন - কার্বনট্রেট্রাক্লোরাইড বিশেষ ধরণের স্নায়ুকোষকে উদ্দীপিত করে বেশি পরিমানে এপিনেফিন এর নিঃসরণ ঘটায়। অধিক পরিমানে নিঃসৃত এপিনেফিন যকৃত কোষ বিনষ্ট করে।

কি কি প্রভাব বিস্তারকারী শর্ত দূষকের বিষক্রিয়ার জন্য দায়ী?

বাইরের এবং আমাদের শরীরের বেশ কিছু আভ্যন্তরিন শর্ত বা ফ্যাকটগুলোর উপস্থিতিতে দূষকের টক্সিসিটি আরো বেড়ে যায়। যেমন -

১। দূষকের ঘনত্ব ও ক্রিয়াকাল — মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর দূষকপদার্থের প্রভাব নির্ভর করে বাতাসে উপস্থিত দূষকের ঘনত্ব ও এক্সপোজার টাইম অর্থাৎ দূষকের প্রকট কালের ওপর।

২। দূষকের প্রকৃতি — দূষণের প্রভাব বা মাত্রা কতটা হতে পারে তা নির্ভর করে দূষকের রাসায়নিক প্রকৃতিক ওপর।

৩। যৌথক্রিয়া — ২বা ২য়ের বায়ুদূষকের মিলিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিষক্রিয়ার অর্থাৎ টক্সিটির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনাকে বলে যৌথক্রিয়া। এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি দ্রুত হয়।

৪। দূষকের জৈব সক্রিয়তা — কোষ বা কোষীয় উৎসেচকের সঙ্গে বায়ু দূষকের রাসায়নিক সংবেদনশীলতাকে জৈব-সক্রিয়তা বলে। যে দূষক যত বেশি জৈব-সক্রিয়, সেই দূষক তত বেশি ক্ষতিকারক।

৫। মানুষের বয়স ও লিঙ্গ — দূষণজনিত প্রভাব অর্থাৎ দূষণের কারণে শরীরখারাপ, এক একজনের এক রকম হয়। বেশির ভাগ সময়ই দূষণের মাত্রা বয়সের ওপর নির্ভর করে। বাচ্চা এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রেই বায়ুদূষক বেশি মাত্রায় প্রভাব ফেলে। তুলনায় যাঁরা যুবা, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিরা কম আক্রান্ত হন। সহজ উদাহরণ হল সালফারডাই অক্সাইড গ্যাস - এটি বয়স্ক মানুষের চেয়ে বাচ্চাদের ওপর ৩গুন বেশি খারাপ প্রভাব ফেলে। শুধু বাচ্চা বা বৃদ্ধ মানুষেরাই নন। নানা গবেষণায় দেখা গেছে যে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের বায়ুদূষকের প্রতি অধিক সংবেদনশীল। অর্থাৎ মেয়েরাই বেশি দূষণজনিত ক্ষতির শিকার হন।

৬। মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা — মানুষের স্বাস্থ্য নানা কারণে নির্ভর করে। নিম্নমানের পুষ্ট, মন্দ বা বেহিসেবি খাদ্যাভাব, অতিরিক্ত স্ট্রেস, স্ট্রেন বা নানা রোগ - এসবই স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। এর ওপর যদি হার্ট, ফুসফুসের কোন স্থায়ী রোগ থাকে, তাও খারাপ স্বাস্থ্য ডেকে আনে। খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ধুমপানের অভ্যাসও যথেষ্ট দায়ী। মন্দ স্বাস্থ্য বায়ুদূষকের প্রতি অধিক সংবেদনশীল। স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে বায়ুদূষকের কারণে দূষণজনিত ফলাফল খুব সহজেই শরীরে দেখা দেয়। যেমন - এমফাইসিমা রোগটি হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে ফরম্যালডিহাইড। অধূমপায়ী ব্যক্তিদের চেয়ে ধুমপায়ীদের ক্ষেত্রে এই রোগটি হওয়ার সম্ভবনা প্রায় ৮০ শতাংশ বেশি।

৭। মানুষের পেশা — দূষণজনিত রোগ কত তাড়াতাড়ি কোন মানুষের দেখা দেবে, সেক্ষেত্রে মানুষের পেশাও একটি অন্যতম ভূমিকা পালন করে। পেশাগত কারণে যারা বেশি-বেশি দূষকের সংস্পর্শে আসেন, ফলে রোগের শিকারও হন বেশি। যেমন - বাস কন্ডাকটর, ড্রাইভার, ট্রাফিক পুলিশ প্রভৃতি পেশার লোকজনেরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাড়াতাড়ি দূষকের দূষণে রোগাক্রান্ত হবেন। ইনডোর পলিউশন এক্ষেত্রে ডবল এক্সপোজার এর ভূমিকা পালন করে।

স্বাস্থ্যের ওপর এরফলে সরাসরি কি প্রভাব পড়ে?

হ্যাঁ। এইসব দূষকের প্রভাবে মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দেখা দেয় নানা রোগ। মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর সাধারণত দুই ভাবে প্রভাব পড়ে।

১। ক্ষণস্থায়ী প্রভাব বা অ্যাকিউট ইফেকট ঃ- অ্যাকিউট ইফেকট দেখা দেয় বাতাসে দূষকের স্বল্পকালীন উপস্থিতির ফলে। অর্থাৎ দূষক যতক্ষণ বাতাসে উপস্থিত থাকে ততক্ষণ এর প্রভাবে শরীরে থাকে কিন্তু দূষক অপসারিত হলেই মন্দ প্রভাবগুলো চলে যায়। বায়ুদূষকের সঙ্গে সম্পর্কীয় কয়েকটি অ্যাকিউট ইফেকেট্‌র উপসর্গ -

ক) কার্বনমনোক্সাইড জনিত ঃ এই গ্যাস দেহের কোষে অক্সিজেন সরবরাহকারী লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে এবং পেশিকোষের অক্সিজেন সরবরাহকারী মায়োগ্লোবিনের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে যায় ও কার্বোহিমোগ্লোবিন যৌগ তৈরি করে। এতে কলা-কোষে অক্সিজেন পরিবহন ঠিকমতো হয় না। কারণ অক্সিজেন তুলনায় কার্বনমনোক্সাইডের হিমোগ্লোবিন আসক্তি অনেক বেশি। ফলে, অক্সিজেন কার্বোহিমোগ্লোবিন যৌগ থেকে কার্বনমনোক্সাইড প্রতিস্থাপিত করতে পারে না। দেহে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। এরফলে, মাথাধরা, ঝিমুনি, ক্লান্তি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে এতে (মূলত অক্সিজেন অভাবে) অনেকসময় মৃত্যুও হতে পারে।

খ) সালফার ডাই অক্সাইড ঘটিত ঃ এই গ্যাসে অ্যাকিউট প্রকটে শ্বাসনালিতে প্রদাহ অর্থাৎ ইনফেক্সেমেশন, অ্যাজমা, কাশি, রাইনাইটিস বা নাসিকার জ্বালা, নাক দিয়ে অনবরত জল পড়া, হাঁচি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

গ) নাইট্রোজেন অক্সাইড ঘটিত ঃ এই গ্যাসের অ্যাকিউট প্রকটে ফুসফুসীয় জ্বালা বা লাং, ইরিটেশন দেখা দেয়।

এরপর 6 পাতায়

ঘরের দূষণে নানা অসুখ

5 পাতার পর

ঘ) কণা জনিত ঃ বিভিন্ন রকমের কণা, পার্টিকুলেট প্রভৃতির কারণে শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ইরিটেশন সৃষ্টি হয়। সাময়িক শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

ঙ) আলোক-রাসায়নিক জারক ঘটিত ঃ এই জারকের অ্যাকিউট প্রকটের কারণে শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ও চোখে ইরিটেশন হয়। অ্যাকিউট উপসর্গ তৈরি করে এমন একটি খুব পরিচিত আলোক-রাসায়নিক জারকের উদাহরণ হল ফরম্যাল্ডিহাইড।

চ) অন্যান্য গ্যাস জনিত ঃ ওজন গ্যাস শ্বাসনালির জ্বালা সৃষ্টি করে। হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথাইল ও ইথাইল মারক্যাপট্যান প্রভৃতি অতিরিক্ত উপস্থিতিতে শরীরে অস্বস্থি, মাথাধরা, আম্লান অবসাদ ইত্যাদি দেখা দেয়।

২। দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বা ক্রনিক ইফেকট্ - দূষক পদার্থের দীর্ঘকালীন উপস্থিতিতে শরীরে ক্রনিক ইফেকট্ দেখা দেয়। ইনডোর পলিউশন ও বায়ুদূষণের যৌথ ফলাফলে বিভিন্ন ক্রনিক রোগ, অঙ্গ সংস্থানিক বিকৃতি এবং জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে। কয়েকটি খুব পরিচিত ক্রনিক ইফেকট্ -

ক) ব্রঙ্কইটিস ঃ ইনডোর পলিউশনের অন্যতম কারণ সিগারেট ধুমপান ও অন্যান্য বায়ুদূষক যেমন - সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এবং ওজোন গ্যাস ব্রঙ্কইটিস সৃষ্টি করে। এতে ফুসফুসে বায়ু পরিবহনকারী ব্রঙ্কই ও ব্রঙ্কিওল (শ্বাসনালি) তে স্থায়ী স্ফীতি ও প্রদাহ ঘটে। ফলে, দীর্ঘস্থায়ী কাশি, অতিরিক্ত মিউকাস ক্ষরণ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট দেখা দেয়। এসবই ব্রঙ্কইটিসের উপসর্গ ও লক্ষ্য। শুধুমাত্র উদ্বায়ী জৈব দূষক পদার্থজনিত ইনডোর পলিউশনেও এই ধরণের রোগ হতে পারে।

খ) এমফাইসিমা ঃ এমফাইসিমা হল বায়ুদূষকের কারণে হওয়া একটি অনারোগ্য ব্যাধি। সিগারেট ধুমপান জনিত দূষকের কারণে মূলত এটি হয়ে থাকে। এছাড়াও শহরাঞ্চলে বায়ুদূষণ ও ইনডোর পলিউশন, বিশেষ করে ওজোন, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড প্রভৃতির কারণে এমফাইসিমা রোগটির প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। আমাদের দেশে ফুসফুস ক্যানসারের চেয়ে এমফাইসিমায় মৃত্যুহয় অনেক বেশি। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সারা বিশ্বে ফুসফুস ক্যানসার ও টিউবারকিউলোসিসের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ মারা যান এমফাইসিমায়।

এই রোগে আক্রান্ত মানুষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের গ্যাসীয় ব্যাপন অংশগ্রহনকারী অ্যালভিওলাই বা বায়ুথলি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। ব্যাপন তলের আয়তন হ্রাস পাওয়ার ফলে ফুসফুস থেকে রক্তে ব্যাপিত বায়ুর পরিমাণ কমে যায়। ফলে রক্তে ও দেহকোষে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। শ্বাসপ্রশ্বাস সময় দুঃসহ কষ্ট হয়, বিশেষ করে দৈহিক পরিশ্রমের সময় অসহ্য শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

গ) লাং ক্যানসার ঃ ইনডোর পলিউশন ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়াচ্ছে। এমনিতেই প্রধানত ধুমপান ও বায়ুদূষণের কারণেই ফুসফুস ক্যানসার হয়ে থাকে। এইকারণেই শহরের বায়ুদূষণ তাঁর হওয়ায় গ্রামের তুলনায় শহরে ফুসফুসে ক্যানসার আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। ইনডোর পলিউশন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরাসরি ফুসফুস ক্যানসার সৃষ্টি না করলেও কারসিনোজেনের প্রতি মানুষের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তোলে অনেকবেশি। তাই পরবর্তীকালে বাড়ে ক্যানসার হওয়ার সম্ভবনা।

ঘ) পালমোনারি ফাইব্রোসিস ঃ বাড়ি তৈরির সময় বা অন্যান্য কারণে অ্যাজবেস্টাসের প্রকটে বা এক্সপোজারে প্লুরার ফুসফুসের মধ্যে আবরণীকলার ওপরের স্তর অমসৃণ হয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ফুসফুসের এইরকম অস্বাভাবিক অব্যবস্থাকে পালমোনারি ফাইব্রোসিস বলে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট দেখা দেয়।

ঙ) বন্ধ্যাত্ব এবং জন্মগত ত্রুটি ঃ সাধারণত বাতাসে বিভিন্ন ধরণের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের উপস্থিতির কারণেই এই ধরণের সমস্যা দেখা দেয়। তবে, পৃথিবীব্যাপি আজকের নানা গবেষণা বলছে ইনডোর পলিউশনের কারণে ঘরের বাতাসে মিশে থাকা বিভিন্ন উদ্বায়ী জৈব পদার্থের জন্য ভ্রূণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিও বিকাশ এবং বন্ধ্যাত্বসহ নানান রকমের জন্মগত ত্রুটি হতে পারে। ডেকে আনে অ্যানিমিয়া, লিউকেমিয়া বা ক্যানসারসহ আনেক রকমের রোগ।

ইনডোর পলিউশনের বিপদ সবচেয়ে বেশি কাদের ?

সকল মানুষ সমান ভাবে ইনডোর পলিউশনের শিকার হন না। কেউ খুব বেশি হন, কেউ বা কম। আবার অনেকেই এমন আছেন যাঁদের অ্যাকিউট এফেকট্ একটুআধটুহলেও ক্রনিক এফেকট্ সহজে দেখা দেয় নানা গবেষণায় দেখা গেছে যে সকল মানুষ ইনডোর পলিউশন সমানভাবে আক্রান্ত হন না। একথা অবশ্য যেকোন ধরণের দূষণের ক্ষেত্রেই সত্য। বৃদ্ধও অসমর্থ বা রোগগ্রস্ত (বিশেষ করে ফুসফুস ও হৃৎপিন্ড সম্পর্কীয়) ব্যক্তি এবং শিশুরাই বেশি সংবেদনশীল হন অর্থাৎ ইনডোর পলিউশনের শিকার হন এরাই সবচেয়ে বেশি। ফুসফুস ও হৃৎপিন্ডসম্পর্কীয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা কার্বনমনোঅক্সাইডের প্রকটে অসুস্থ হবেন খুব তাড়াতাড়ি এবং এঁদের হার্ট ফেইলিওর হওয়ার সম্ভবনা বেশি, ফলে মৃত্যুও হতে পারে।

এছাড়াও শ্রমজীবী মানুষ যাঁদের কমক্ষেত্রেই সম্মুখীন হতে হয় নানা রকমের বায়ুদূষকের, তাঁদের ক্ষেত্রেও ইনডোর পলিউশনের প্রভাব বেশি হবে। কারণ এক্ষেত্রে তাঁদের ডাবল এক্সপোজার ঘটে। যেমন - খনি শ্রমিক, ইন ভাটার কর্মী, বাস কন্ডকটর, ড্রাইভার, ট্রাফিক পুলিশ প্রভৃতি পেশার লোকজনের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এই রকম উদাহরণ আরো নানা পেশার লোকজনদের মধ্যেও আছে, এমনকি আইটি সেকটরে ২৪ ঘন্টা কম্পিউটার নিয়ে কাজ করা বন্ধুরাও ডাবল এক্সপোজারের শিকার হচ্ছেন।

দূষণের ফলাফল যে কি মারাত্মক তাতো আমরা জানি, এখানে শুধু অনেকগুলো বিপদের একটা বলছি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে লেডের দূষণজনিত বিষক্রিয়ার বাচ্চাদের বৃদ্ধিবিকাশ ব্যাহত হয়। সোজা কথায় বাচ্চারা বোকা হয়ে যায়। তাই, চিন্তা হচ্ছে, প্রশন্ উঠছে, আমাদের পরের প্রজন্ম কি তবে দিনে দিনে আরো বোকা হয়ে পড়বে ?

লেখক ঃ ডঃ সোমা বসু, মোঃ-৯৪৩৩৯৪১৭৭৬
Email : bsoma25@rediffmail.com

পাখি নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনী ঃ ৮ মার্চ বিজ্ঞান দরবারের ১৬নং টেলার রোড কার্যালয়ে অজয় হোম শত বর্ষ স্মরণে বয়সা বিলের পাখি নিয়ে এক রঙিন আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান কর্মী সম্রাট সরকার বক্তব্য রাখেন। পরিবেশ কর্মী সৌরভ মুখার্জী ওড়িশার চিলিকা হ্রদের পাখি ও পরিবেশ নিয়ে আলোকচিত্র সহযোগে বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিজ্ঞান দরবারের সভাপতি ডঃ গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী।

অক্লান্ত কর্মী ঃ বিজ্ঞান প্রচারক মিহির ভট্টাচার্য

বাংলা ভাষায় যাঁরা নিয়মিত ভাবে বিজ্ঞানের বিষয়ে লেখালিখি করেন, তাঁদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কিনা সন্দেহ, যিনি মিহির কুমার ভট্টাচাযের কাছ থেকে তাঁর লেখা বিষয়ে মতামত সম্বলিত পোস্ট কার্ড পাননি। অনেক সময় ফোন করেও মতামত জানাতেন নিজের গরজেই। আপন আন্তরিক দায়বদ্ধতায়। এভাবেই মিহির ভট্টাচার্য মহাশয় অনেকের কাছেই হয়ে উঠেছিলেন 'আগ্রহের মিহিরদা'।

আমি মিহিরদাকে প্রথম দেখি ১৯৭২-৭৩ নাগাদ। কোনও কাজে এসেছিলাম বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে। কাজ মিটিয়ে চলে যাচ্ছি। বেশ দূর থেকে চেয়ারে বসা মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক হাতে নেড়ে ইশারায় ডাকলেন। কাছে আসার ইঙ্গিত দিয়ে। 'বসুন'। এইভাবে প্রথম আলাপ, লিখছেন তো! লেখা পড়ে কারা? লিখে হবেই বা কি? কাদের জন্য লেখেন? — এমন বেশ কয়েকটি প্রশ্ন বেশ কঠিন সুরে। উত্তরে কী বলেছিলুম তা আজ আর মনে নেই। তবে এই আলাপ পরে ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হয়। বিশেষ করে গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি গড়ার পর থেকে ওঁর কাঁকুড়গাছির নিবাসে বহু বার গিয়েছি, খেয়েছি, আলাপ থেকে আড্ডাও জমেছে। এই বিতর্কও হোত। তবে মিহিরদা, ওঁর বিশ্বাসের জগতে একান্ত দৃঢ়।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার হালহকিকতের খোঁজ খবরের সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য ভান্ডারী ছিলেন মিহিরদা। মনেও রাখতেন। আমাকে ফোন করলেন, 'কী ব্যাপার, অনেকদিন কোথাও কোনও লেখা দেখছি না কেন? লেখা বন্ধ করবেন না, চালিয়ে যান। লেখা ছাপা হলে অবশ্যই আমাকে পাঠাবেন। পড়ব, পড়ে মতামত দেব।' আর একটা বিষয়ে মিহিরদার চোখ থাকত খুব সজাগ। সত্যেন্দ্র পুরস্কার, মেঘনাথ পুরস্কার, গোপালচন্দ্রপুরস্কার, রবীন্দ্র পুরকার খবরের কাগজে এসবের বিজ্ঞাপন বেরোলে মিহিরদার ফোন যাবে নির্দিষ্ট বেশ কিছু বিজ্ঞান লেখক বা লেখিকার কাছে। পুরস্কারের জন্য বায়োডাটা পাঠান। মিহিরদা চাইতেন, যোগ্য মানুষের হাতে যেন এইসব পুরস্কার ওঠে। দু'একবার ক্ষোভও প্রকাশ করেছেনপুরস্কার ঘিরে।

কমবেশি প্রায় দু'দশক সময়কাল মিহিরদা যে বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন, তা হোল 'গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান সমিতির' কাজকর্ম ঘিরে। বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক-প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্রের কাজকে 'আমজনতার' মাঝে ছড়াবার প্রয়াসে ওঁর আন্তরিক আগ্রহ সুবিদিত। রেডিও-টিভিতে এই বিষয়ে একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি যুক্ত থেকেছেন। গোপাল চন্দ্রের জন্মদিন (০১-০৮-১৮৯৫) ও মৃত্যুদিন পালনের (০৮-০৪-১৯৮১) অনুষ্ঠান উনি নিয়মিত ভাবে আয়োজন করতেন মাননীয় দেবব্রত মন্ডল ও অন্য অনেকের সহায়তায়। অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখক এই সমাবেশে এসেছেন। বক্তৃতা করেছেন। এইসব যোগাযোগ উনি ধরে রাখতেন চিঠি ও ফোনের মাধ্যমে। তাই ওঁর পরিচিতির গন্ডিটা ছিল বেশ বৃহৎ। গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈজ্ঞানিক জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রথম জীবনীমূলক বই লেখেন অধ্যাপক রণতোষ চক্রবর্তী। রণতোষবাবু আমাকে একাধিকবার বলেছেন, এই কাজে মিহিরবাবুর নিবিড় সহযোগিতা, পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান ছিল বর্ণনার অধিক। পরবর্তীকলের বিজ্ঞান লেখকগণ যাঁরা গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যকে নিয়ে লিখেছেন, তাঁদেরও মিহিরদা সহযোগিতা করেছেন আপন তাগিদে। উৎস মানুষ, শৈব্যা প্রকাশনী, দে'জ পাবলিশার্স—এসবের সঙ্গে উনি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রেখে কাজ করেছেন দীর্ঘকাল।

একেবারে শেষে লিভারের ক্যান্সারজনিত সংক্রমণে মিহিরদা আক্রান্ত হন। নানা রকম চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারে মিহিরদা বেশ কাহিল। শক্ত খাবার চিবিয়ে গিলে খেতে পারছেন না। বাড়িতে বৌদি সেদ্ধ করে তরল করে চামচে খাইয়ে দিয়েছেন বেশ করেকমাস। বলতেন, খাচ্ছি! কিন্তু খাবারের কোন স্বাদ পাচ্ছি না। রোগাক্রমণের দিনগুলিতেও ওঁর বাড়িতে গিয়েছি প্রথমেই জানতে চাইতেন কোথায় কী হচ্ছে, কে কী করছে.....অর্থাৎ খবরাখবর। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মূল ভাবনাকে উনি বহন করেছেন মৃত্যুর আগের মূহূর্ত অবধি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা - ওঁর রক্তে মিশে ছিল পারিবারিক ঐতিহ্যের বহমান ধারায়।

লেখক ঃ দীপক কুমার দাঁ, মোঃ- ৯৪৭৪১৯২৭৯৯
পোঃ- ফাঁটুরা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৭৩

গঙ্গাজল পচে না কেন

1 পাতার পর

দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটু অনুসন্ধান করলেই জানা যাবে কেন গঙ্গা জলে পচন ধরে না।

কোনো জিনিসে পচন ধরে কেন? এর কারণ ব্যাকটিরিয়া। এই এককোষী জীবানুগুলির বংশ বৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত। মাত্র কয়েক ঘন্টায় একটি ব্যাকটিরিয়া থেকে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটিরিয়ার জন্ম হতে পারে। গঙ্গাজলেও ব্যাকটিরিয়া আছে। তবে এদের বংশবৃদ্ধির হার দ্রুত হতে পারে না কারণ গঙ্গা জলে ব্যাকটিরিওফাজ নামে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক ধরণের ভাইরাস আছে। সাধারণত অন্য কোনো জীবন্ত জিনিসের সংস্পর্শে না এলে ভাইরাসে জীবনের লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু কোনো জীবিত বস্তুর সংস্পর্শে এলে দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি ঘটে। গঙ্গা জলের ব্যাকটিরিওফাজ ভাইরাসও জীবন্ত ব্যাকটিরিয়ার সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে বংশবৃদ্ধিশুরু করে এবং জলের ব্যাকটিরিয়াগুলিকে মেরে ফেলে। আর এটাই হল কোনো পাত্রে গঙ্গা জল দীর্ঘদিন রেখে দিলেও তাতে পচন না ধরার আসল রহস্য।

ছোটবেলা থেকে আমরা যা শিখি তা অন্ধের মত বিশ্বাস করি। ফলে অনেক ভ্রান্ত ধারণার শিকার হই। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত যা জানছি, যা শুনছি তা সঠিক কিনা জেনে নেওয়া।

লেখক ঃ কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোঃ- ৯৪৩৩১৪৫১১২

---

২২ মার্চ বিশ্ব জল দিবসে চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা সারা দিন ব্যাপী এক প্রচার অভিযানের আয়োজন করে। চাকদহ পৌর ও গ্রামীন অঞ্চলে আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবীতে ব্যাচ পড়ান। সংস্থার পক্ষ থেকে দীর্ঘ দিন ধরে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের দাবীতে প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে।

সাবধান!

সানস্ক্রিন লোষন

বেশির ভাগ ক্যান্সারই বংশগতির জিন-জাত নয় বরং জিনগত পরিবর্তন। আমরা ডেকে আনি জীবনকালেই জীবনশৈলীর প্রভাবে। কেউ কেউ এমন আছেন যার সূর্যালোক স্পর্শকাতরতার বা অনুভূতির শিকার। অতি বেগুনী রশ্মির জন্য ত্বকের যে ক্ষতি তাদের জিন তা মেরামত করতে পারে না। আলোর বিষন থেকে ত্বকের কোষের ক্ষতি করে। একে সানবার্ন বলে বা রোদে পড়া। ত্বক লাল হতে-ফুলে যেতে পারে-তাপে পোড়া অঞ্চলের ত্বকের রঙকে কালো করে দেয়। এই একই রকম বিষন ঘটাতে পারে ডিওডোরান্ট ব্যাকটিরিয়া প্রতিরোধী সাবান, কৃত্রিম সুগার ফ্রি, ক্যালসিয়াম সালফাইড (টাটুর সময় ঢোকানো হয়) এবং ফ্লোরোসেন্ট উজ্জ্বলতা দেয় এমন উপাদান যা নাইলন, উল, মখবল এবং পেট্রোপন্যে ব্যবহার করা হয়।

ফটো অ্যানার্জি বা সূর্যরশ্মিজাত অ্যালার্জি তৈরি হয় ইমিউনিটিজাত প্রতিবর্তী ক্রিয়া থেকে - যখন আগে দেহে প্রবিষ্ট কোনো কেমিক্যাল শেনশিটাইজড় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয়বার ঢোকামাত্র তা একজিমার মত ছেপে হয়ে বেরিয়ে আসে সূর্যালোক প্রভাবে। প্যারাঅ্যামাইনো বেনজোয়িক অ্যাসিড বা 'পাবা' এই কাজটি করে থাকে। দলে আরো যারা আছে, তারা হল শিনামেটস্, অ্যাভোবেনজোন, অক্সিবেনজোন, প্যাডিমেটতিন বেনজোইল মিথেনশ্, মাস্ক অ্যামব্রেট এবং চন্দন কাঠের তেল।

ফিজিক্যাল ও কেমিক্যাল দুভাবে সানস্ক্রিন কাজ করে - ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে ত্বকে এক আস্তরণ এক আচ্ছাদন তৈরি করে দেয় - যা আপতিত সূর্যকিরণকে প্রতিফলিত প্রতিসরিত করে দেয় - যা জিংক অক্সাইড ও টিটানিয়াম ডাইঅক্সাইড গোত্রের। একটি কৌশল আছে - এই সমস্ত সানস্ক্রিন পন্যে ন্যানো অকৃতির ন্যানো আয়তনের উপাদান রাখা হয় এবং টিটানিয়াম ডাইঅক্সাইড কুড়ি ন্যানো মিটার আকারের জলে তা বর্ণহীন হবে এবং যখন সূর্যরশ্মি অতিবেগুনী রশ্মি ও জল শক্তিশালী দ্রবণ ও ফ্রি র‍্যাডিক্যাল গুন ধর্মী মিলে 'ডিএনএ'র ক্ষতি করে; অন্যদিকে পাঁচশো ন্যানোমিটার আকারের ডিএনএ'র ক্ষতি সামান্য। অর্থাৎ জিনেকোডে ছোটখাটো ক্ষতি মেরামত করে দিতে পারে এমন ব্যবস্থা আছে এবং ঐ কুড়ি ন্যানোমিটারের টিটায়িাম ডাইঅক্সাইড ডিএনএ'র যে ক্ষতি করে তার মেরামতি হয় না।

কেমিক্যাল সানস্ক্রিন-এ থাকে বেনজোফেনোল ও সিনামেটস্ এরা অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নেয় এবং ভিতরে তাপ ছড়িয়ে দেয়। কেমিক্যালও ভেঙে যায় তাপের প্রভাবে - এর একটি বৈজ্ঞানিক নাম ডিনেচার হওয়া; এই ভেঙে যাওয়ার কারণে কেমিক্যালটি বারে বারে ব্যবহার করতে হয়। এই কেমিক্যাল শতকরা দশের বেশি ঘনতে মেশানো হয় না। এগুলি ময়শ্চেরাইজার এর উপাদানেও মেশানো হয়ে থাকে। এরা সবাই ফ্রি র‍্যাডিক্যাল তৈরি করে এবং তাই ডিএনএ'র শত্রুও বটে। স্নান ও হাত মুখ ধোয়া ইত্যাদির কারণে সানস্ক্রিন উপাদানের কেমিক্যালগুলি ভাল জল বা তাজাজল এবং সমুদ্র জলের পরিবারে গিয়ে মেশে। এভাবে কোরাল ব্লিচিং ঘটছে এবং আরো অনেক অজানা ক্ষতি করেই চলেছে। তার উত্তর নেই, তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উভয় ক্ষেত্রেই। সানস্ক্রিন লোশনের কেমিক্যাল মেলানোমার মত ক্যানসার আটকাতে পারছে কিনা এ সন্দেহ থেকে গেছে এবং আরো বেড়ে যাচ্ছে।

ন্যানো পার্টিকলস্ বা মৌলকণা যত ক্ষুদ্র হবে, যত মাইক্রো আয়তন হবে ততই তার পক্ষে মানবদেহ কোষের অভ্যন্ত্র অবাধে প্রবেশ করতে সহজ হয়। ন্যানো পার্টিকলস ভোগ্যপন্যে ব্যবহারের সময় অনেক ক্ষেত্রেই তা ২০ বা ১০ ন্যানোমিটারের নীচে রাখা হয়, পন্যটিকে বাজারে উপভোক্তাদের কাছে আদৃত হবার জন্য। মনোহরণের জন্য আকর্ষনীয় করার জন্য। সানস্ক্রিনের টিটানিয়াম ডাইঅক্সাইড এর মৌল কণা ন্যানোত্বের কারণে জলের সঙ্গে মিশে হাইড্রোক্সিল র‍্যাডিক্যাল তৈরি করে যা কিনা ডিএনএ স্ট্রান্ডের ক্ষতি করে দিতে পারে।

কেমিক্যাল সানস্ক্রিনের পন্যে ব্যবহার হয় এমন কয়েকটি উপাদান। এরা অন্যত্র ইউভি ফিলটার পন্যেও থাকে। যাদের ক্ষতিকর বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে তা শন্নিবেশিত করে পরিবেশিত হল ঃ ক) অ্যানথ্থালেটস্ - ইউরোপে ও জাপানে ব্যবহার হয় না, খ) বেনজোফেনোনস্ ব্যবহারকারী মাতৃদুগ্ধে এবং মূত্রে পাওয়া গেছে ফ্রির‍্যাডিক্যাল তৈরি করে অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে (গ) ক্যামফর ডেরিভেটিভস্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহার হয় না। এন্ড্রেক্রিন ব্যবস্থাকে ক্ষতি করে, হাইপো থাইরয়েডিজম্ এর দিকে নিয়ে যায় (ক্যামফর হল কর্পূর), (ঘ) শিনামেটস্-মাতৃদুগ্ধেও পাওয়া যায়। ত্বকে দহন এবং অ্যালার্জি ডেকে আনে কোন কোন শিশু বুকের দুধ খেতে চায় না এই কারণে (ঙ) ডাইবেনজেইল মিথেনস এর ডেরিভেটিভস্ অ্যাভোবেনজোন ফ্রি র‍্যাডিক্যাল তৈরি করে এবং ডি এন-এ'র ক্ষতি করতে সমর্থ; (চ) অক্টোক্রাইলিন ত্বকে দহন ও কনট্যাক্ট ডারমাটাইটিস তৈরি করে, (ছ) প্যারা অ্যামাইনো বেনজোয়িক অ্যাসিড (পাবা) আলো স্পর্শকাতরতা অনুভূতি এবং অ্যালার্জি তৈরি করে এবং কানাডাতে এই উপাদান নিষিদ্ধ। ফ্রি র‍্যাডিক্যাল তৈরি করে; ত্বকের ক্যান্সার তৈরি করতে পারে, (জ) স্যালিসাইলেটস্ - সূর্যালোক থেকে যোগ্যতার সঙ্গে ত্বক রক্ষা করতে পারে না।

লেখক ঃ রঞ্জিৎ পাল, মোঃ- ৯৮৩১২০৬৫৪৬

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in
bijnandarbar1980@gmail.com